কাইয়ূম খিযির

বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে

ছাদেকপুরী পরিবারের আত্মত্যাগ

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

সম্পাদনা : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাদেকপুরী পরিবারের আত্মত্যাগ

মূল (উর্দূ) : ক্বাইয়ূম খিযির
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকের নিবেদন	০৪
১. বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাদেকপুরী পরিবার	১৩
ভূমিকা	১৩
পরিবার পরিচিতি	১৫
জিহাদ আন্দোলনের প্রকৃতি	১৫
জিহাদ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ	১৬
(১) মাওলানা বেলায়েত আলী	১৬
দাওয়াতী তৎপরতা	১৭
জিহাদের ময়দানে	১৮
চরিত্র	২০
(২) মাওলানা এনায়েত আলী	২১
মাওলানা এনায়েত আলীর কর্মপদ্ধতি	২৩
মাওলানার ব্যক্তিত্ব	২৪
(৩) আমীর আব্দুল্লাহ বিন বেলায়েত আলী	২৫
প্রথম মুক্তি সংগ্রাম	২৭
দমন কৌশল	২৮
নির্যাতনের ছিটেফোঁটা	৩২
উপসংহার	৩২
২. ছাদেকপুর, পাটনা : ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গের সূতিকাগার	৩৩
ভূমিকা	৩৩
ছাদেকপুর, পাটনা: ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গের সূতিকাগার	৩৪
ছাদেকপুরী পরিবারের উপর অত্যাচার	৫০
মাওলানা আহমাদুল্লাহ্‌র গ্রেফতারী	৬১
৩. নিভে গেল ছাদেকপুরী পরিবারের শেষ দেউটি	৬৯
পরিশিষ্ট : ছবি সমূহ	৭৬

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والســـلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

সম্পাদকের নিবেদন (كلمة المراجع)

যার ইতিহাস জ্ঞান নেই তাকে জ্ঞানী বলা যায় না। কেননা অতীতের উপর ভবিষ্যৎ নির্মিত হয়। আর এজন্যই পবিত্র কুরআনে অতীতের অভ্রান্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সাধারণত ইতিহাস নেতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বালাকোটের শহীদায়েন ও পরবর্তীতে পাটনার ছাদেকপুরী পরিবার যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যার ফলে পরাধীন ভারত আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের মর্যাদা পেয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যার চূড়ান্ত রূপ হিসাবে আজ আমাদের নিকট সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট। দো'আ করি আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে পড়ে যেন পুনরায় তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হয়।

১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার পূর্বাহ্নে বালাকোটের ময়দানে মুজাহিদ বাহিনীর জনৈক পাহারাদারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে *(থিসিস ২৮৪ পৃ.)* সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) ও আল্লামা ইসমাঈল (১৭৭৯-১৮৩১)-এর শাহাদত বরণের পর কিঞ্চিদধিক সোয়াশো বছর ব্যাপী (১৮১৬-১৯৫১ খৃ.) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ২য় পর্যায়ের নেতৃত্বকালে পাটনা আযীমাবাদের ছাদেকপুরী পরিবার যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তারই বাণীচিত্র অঙ্কিত হয়েছে অত্র বইয়ে।

হিন্দুস্থানে পরিচালিত (জিহাদ ও) আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী, ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার আবুল হাসান আলী নাদভী (১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.) বলেন,

'হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছ আন্দোলন চারটি বুনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১- খালেছ তাওহীদ বিশ্বাস ২-ইত্তেবায়ে সুন্নাত ৩- জিহাদী জাযবা এবং ৪- আল্লাহ্র নিকটে বিনীত হওয়া।... অন্য দলগুলিকে দেখ, সেখানে তাওহীদ আছে তো ইত্তিবায়ে সুন্নাতে অলসতা আছে। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জাযবা আছে তো জিহাদের জাযবা নেই। কোথাও যিকির-ফিকির আছে তো ইত্তেবায়ে সুন্নাত নেই। লোকেরা বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলিকে নিয়ে সেগুলিকে আমলের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হ'য়ে শহীদায়েনের (সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ) ছূরতে আত্মপ্রকাশ করেছে...*(থিসিস পৃ. ৫৮)*।

তিনি বলেন, 'আল্লামা ইসমাঈল শাহ অলিউল্লাহ্র খান্দানের পবিত্র বৃক্ষের (شجرۂ طوبیٰ) একটি শাখা, শাহ ছাহেবের খ্যাতিমান পৌত্র, শাহ আব্দুল গণীর পরকালীন নাজাত ও মাগফিরাতের অসীলা-সন্তান, শাহ আব্দুল আযীয, শাহ আব্দুল কাদের ও শাহ রফীউদ্দীনের প্রিয়তম ভাতীজা ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শাগরিদ। শুধু তাই নয়, তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি যে কওম ও যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে কওম ও সে দেশের জন্য গর্বের বস্তু হিসাবে গণ্য হন। তিনি ইসলামের সেই সব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রতিভাবান, দুঃসাহসী ও অসাধারণ প্রতিভাবানদের অন্তর্ভুক্ত- শত শত বছরেও যাঁদের দু'একজন কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করে থাকেন' *(থিসিস পৃ. ২৫৮)*।

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮ খৃ.) বলেন, 'India has hitherto produced only one Moulavi and he is Moulavi Mohammad Ismail'. 'ভারতবর্ষ এযাবৎ মাত্র একজন মৌলভীর জন্ম দিয়েছে। আর তিনি হ'লেন মৌলভী মুহাম্মাদ ইসমাঈল *(থিসিস পৃ. ২৫৮)*।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তিনি কেবল শিখ ও ইংরেজ বিতাড়নের যুদ্ধেই অবদান রাখেননি। বরং ইসলামের নামে মুসলিম সমাজে পুঞ্জীভূত কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধেও ঘোষণা করেছিলেন আপোষহীন জিহাদ। আর সেজন্য তিনি সমসাময়িক ওলামা ও রেওয়াজপন্থী মুসলমানদের নিকট

দারুনভাবে ধিকৃত হন। এমনকি কুফরী ফৎওয়ারও সম্মুখীন হন। কিন্তু তাঁর এই আপোষহীন জিহাদী আন্দোলন পরোক্ষভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে তোলে। যে আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর রেখে যাওয়া মিশন আজও ভারতবর্ষে কমবেশী চালু আছে *(থিসিস পৃ. ২৫৯)*।

১৮৩১ সালে ৬ই মে বালাকোট বিপর্যয়ের সময় মাওলানা বেলায়েত আলী (১৭৯০-১৮৫২ খৃ.) আমীর সৈয়দ আহমাদের (১৭৮৬-১৮৩১ খৃ.) নির্দেশে হায়দরাবাদে অবস্থান করছিলেন। প্রেরণ কালে আমীর তাকে বলেছিলেন, আমি আপনাকে বীজ হিসাবে হিন্দুস্থান পাঠাচ্ছি। আপনার মাধ্যমে সেখানে হাযারো গাছের জন্ম হবে *(থিসিস পৃ. ২৯২)*। কিন্তু হঠাৎ বালাকোটের দুঃসংবাদ এবং একই সময় পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি পাটনা ফিরে আসেন। অতঃপর মেজ ভাই এনায়েত আলীকে বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রেরণ করেন *(থিসিস পৃ. ২৯৩)*।

মাওলানা বেলায়েত আলী তাঁর চারপাশে সর্বদা সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন দেখতে চাইতেন এবং যাবতীয় বিদ'আত দূরীকরণের চেষ্টায় রত থাকতেন। তাঁর মুরীদান ও আশপাশের সমস্ত লোক কিতাব ও সুন্নাতের পাবন্দ হয়ে গিয়েছিল *(থিসিস পৃ. ২৯১)*।

মাওলানা এনায়েত আলী (১৭৯২-১৮৫৮ খৃ.) তৎকালীন যশোর যেলার হাকিমপুরকে কেন্দ্র করে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা, সাতক্ষীরা, খুলনা, যাশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, বগুড়া অঞ্চলে ব্যাপক তাবলীগী তৎপরতা চালাতে থাকেন। তিনি কোন এলাকায় গেলে প্রথম নছীহতের মাধ্যমে তাদেরকে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত হবার আহ্বান জানাতেন। অতঃপর মসজিদ না থাকলে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতেন ও ইমাম নিয়োগ করতেন। ইমাম নিয়োগের পর তাঁর নেতৃত্বে জামা'আত কায়েম করতেন ও স্থানীয় যাবতীয় বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব উক্ত ইমামের উপরে ন্যস্ত করতেন *(থিসিস পৃ. ৪১৪)*।

১৮৫০-এর গোড়ার দিকে রাজশাহীর যেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যখন মাওলানা এনায়েত আলীকে যেলা হ'তে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন, তখন তিনি পাটনা চলে যান *(থিসিস পৃ. ৪০৯)*। ১৮৩৩-১৮৪৩ এবং ১৮৪৭-১৮৪৯

দু'বারে মোট বারো বছরের মত সময় মাওলানা এনায়েত আলী বাংলাদেশ অঞ্চলে অতিবাহিত করেন। অবশ্য হজ্জে যাওয়া (সম্ভবত ১৮৩৬ সালের দিকে) ও আসার পথে (কয়েক বৎসর পর) বড় ভাই মাওলানা বেলায়েত আলী বাংলাদেশে কিছুদিন অবস্থান করেন *(থিসিস পৃ. ৪০৯)*।

একবার পাবনা শহরে তাবলীগে এসে মাওলানা এনায়েত আলী 'চাপা মসজিদে' ওঠেন। সেদিন ছিল 'মাদার পীরের' বাঁশ উঠানো উৎসব। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিরাট আকারে উৎসব চলছিল। মাওলানা সোজা উৎসবমঞ্চে উঠে গিয়ে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে এক দরদমাখা জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। উৎসবের হোতা গাদল খাঁ সহ উপস্থিত শত শত লোক তওবা করে মাওলানার হাতে বায়'আত করেন। পাবনার রাধাকান্তপুরের উক্ত গাদল খাঁ ও তার পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আলী খাঁ আজীবন জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন *(থিসিস পৃ. ৩০৪)*।

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮ খৃ.) ১৯১৩ সালে একবার বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের দুমকা ও মুর্শিদাবাদ যেলার কয়েকটি গ্রাম যেমন দিলালপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর ও বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাই নবাগঞ্জ যেলাধীন নারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রাম সফর করেন। পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে তিনি স্বীয় 'আখবারে আহলেহাদীছ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সেখানে একস্থানে তিনি বলেন, 'আমি এই সফরে কেবলি চিন্তা করেছি বাংলাদেশে আহলেহাদীছের সংখ্যা এত বেশী কিভাবে হ'ল ও কার দ্বারা হ'ল। আমাকে বলা হ'ল যে, এসব মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর বরকতেই হয়েছে' *(থিসিস পৃ. ৩০১-০২)*।

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর খলীফা বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জের পদ্মা তীরবর্তী সূর্য নারায়ণপুরের রফীক মণ্ডল ওরফে রফী মোল্লা, যার সম্পর্কে হাণ্টার বলেন, '১৮৪৩ সালে মাত্র দু'তিন বছর সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় ৮০ হাযার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলেছিলেন এবং তারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা

করে'। ১৮৫৩ সালে গ্রেফতার হওয়ার কিছুদিন পর জঙ্গীপুর জেলখানা থেকে ফিরে এসে তিনি নিজ দায়িত্ব স্বীয় পুত্র আমীরুদ্দীনের উপর ন্যস্ত করেন। আমীরুদ্দীন স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন এবং মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বৃহত্তর রাজশাহীসহ সমস্ত উত্তরবঙ্গে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন' *(থিসিস ৪৩৭-৩৮ পৃ.)*।

রফী মোল্লা ও তার পুত্র মৌলবী আমীরুদ্দীনের সূচিত আন্দোলনের ফসল হিসাবে যা আমরা এখন প্রত্যক্ষ করি, তা এই যে, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ বরেন্দ্র অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক নাগরিক শিরক ও বিদ'আত হ'তে তওবা করে মুসলিম ও 'আহলেহাদীছ' হয়েছেন এবং অদ্যাবধি বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ অঞ্চল সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবেই পরিচিত। তাদের মধ্যে এখনও শিরক ও বিদ'আত বিরোধী মনোভাব বজায় আছে। ইতিপূর্বে তারা হেদায়েতী, মুহাম্মাদী, পাহাড়ী, ফারাযী, কাবুলী ইত্যাদি নামে পরিচিত হ'লেও বর্তমানে তারা সবাই সাধারণভাবে 'আহলেহাদীছ' নামেই পরিচিত *(থিসিস ৪৩৮-৩৯ পৃ.)*।

বিভিন্ন টোপ ও দুনিয়াবী স্বার্থ দেখিয়ে ইংরেজরা অন্যদের দলে ভিড়াতে পারলেও আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে তারা ভিড়াতে পারেনি। শী'আ, কাদিয়ানী, পীর-আউলিয়া ও নাইট-নবাবরা ইংরেজের বরকন্দাজী করলেও জিহাদ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী প্রমুখ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের আপোষহীন ভূমিকায় তারা ছেদ টানতে পারেনি। তাদের জিহাদ ছিল কুফরী শাসন হটিয়ে ভারতবর্ষে হারানো ইসলামী শাসন ফিরিয়ে আনা এবং মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করা। অতএব আহলেহাদীছদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে সূচিত 'জিহাদ আন্দোলন' ছিল পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ভিত্তি।

ছাদেকপুরী পরিবারের উপর বৃটিশ সরকারের যে লৌমহর্ষক নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে ক্বাইয়ূম খিযির সংকলিত 'ছাদেকপুর পাটনা : কুরবানগাহে আযাদিয়ে ওয়াত্বান' বইটিতে। যেখানে বলা হয়েছে যে, ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার সাময়িক কষ্টের চাইতে বঙ্গোপসাগরের কালাপানিতে মনুষ্য বসতিহীন বিপদসংকুল আন্দামান

দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসন দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করা অধিক যুক্তিযুক্ত। আর সেকারণে ছাদেকপুরী পরিবারের অত্যন্ত প্রভাবশালী কৃতি সন্তান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাওলানা আহমাদুল্লাহকে ১৮৬৪ সালের নভেম্বর মাসে ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে বাড়ী থেকে গ্রেফতার করে সংক্ষিপ্ত ও প্রহসনের বিচারে প্রথমে ফাঁসি, অতঃপর ফাঁসির বদলে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তিনিই ছিলেন ১৮৬৫ সালের জুন মাসে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে (Port Blair) অবতরণকারী প্রথম মুজাহিদ বন্দী। অতঃপর ১৮৬৬ সালের ১১ই জানুয়ারী তাঁর ছোট ভাই মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ও তার সাথীবৃন্দ আন্দামানে পৌঁছেন। ১৮৬৮ সালে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী অসুস্থ হয়ে 'রস' দ্বীপে (Ross Island) জেলখানার হাসপাতালে নীত হন এবং ১৪ দিন পর ২০শে ফেব্রুয়ারী হাসপাতালেই মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ১৮৮১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ভাইপার বা সর্প দ্বীপে (Viper Island) বড় ভাই মাওলানা আহমাদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন ও সেখানেই সমাহিত হন *(থিসিস ৩১৪ পৃ.)*।

সবশেষে চাঁপাই নবাবগঞ্জের মৌলবী আমীরুদ্দীন সহ অবশিষ্ট ছয়জন মুজাহিদ বন্দী সাধারণ ক্ষমার আওতায় ১৮৮৩ সালের জানুয়ারীতে আন্দামানের নির্বাসন হ'তে মুক্তি পান। বাকী পাঁচজন ছিলেন : (১) মৌলবী আব্দুর রহীম যুবায়রী ছাদেকপুরী (১৮৩৬-১৯২৩ খৃ.)। 'তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ'র লেখক। (২) মিয়াঁ আব্দুল গাফ্ফার ছাদেকপুরী। (৩) মিয়াঁ তাবারক আলী বিন মুবারক আলী মুযাফফরপুরী পরে পাটনাবী। (৪) মুন্শী জা'ফর থানেশ্বরী। কালাপানির ইতিহাস 'তাওয়ারীখে আজীব'-এর স্বনামধন্য লেখক। (৫) মাসঊদ খান বাংগালী *(বগুড়া, বাংলাদেশ; থিসিস ৪৩০ পৃ.)*।

এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব নেতা-কর্মী শহীদ হয়েছেন, আন্দামানের কালাপানিতে নির্বাসিত হয়েছেন, পরিবার-পরিজন ও বাস্তুহারা হয়েছেন, পথে পথে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছেন, জান-মাল দিয়ে জিহাদ আন্দোলনকে সাহায্য করেছেন, সেইসব অকুতোভয় মুজাহিদদের জন্য প্রাণখোলা দো'আ রইল। যাদের ত্যাগের সোনালী ফসল আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষ

ও আমাদের মত উপকারভোগী স্বাধীন নাগরিকেরা। *আল্লা-হুম্মাগফির লাহুম ওয়ারহামহুম...!*

সবশেষে বলা চলে যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে আল্লাহ পাকের খাছ মেহেরবাণীতে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি.)-এর শাণিত যুক্তি ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে হাদীছ অনুসরণের জায্বা সৃষ্টি হয় এবং তাঁর পরে তদীয় পুত্রগণ ও মুজাহিদ পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হি.)-এর সূচিত 'জিহাদ আন্দোলন'-এর মাধ্যমে সারা ভারতে একটি সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে, যা আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করে। পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বর্তমানে বসবাসরত কয়েক কোটি আহলেহাদীছ জনগণ সেই বিপ্লবেরই ফসল। যাদের রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় বালাকোট, বাঁশের কেল্লা, মুল্কা, সিত্তানা, আম্বালা, চামারকান্দ, আসমাস্ত ও আন্দামানের রক্তাক্ত স্মৃতিসমূহ, জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কালাপানির অবর্ণনীয় নির্যাতন, গাযী ও শহীদী রক্তের অমলিন ছাপসমূহ আজও ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। যুলুম ও নির্যাতনের আগুনে পোড়া নিখাদ তাওহীদবাদী 'জামা'আতে আহলেহাদীছ' তাই চিরকালীন জিহাদী উত্তরাধিকারের নাম। যেকোন মূল্যের বিনিময়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখার চিরন্তন শহীদী কাফেলার নাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না, ঈমানদার হ'লে তোমরাই বিজয়ী' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

উল্লেখ্য যে, বিগত ২২.৬.৯৮ তারিখে দীন সম্পাদক পাটনার ঐতিহাসিক খোদাবখ্শ লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি তাঁর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' শীর্ষক ডক্টরেট থিসিসটি (রাবি ১৯৯২) উপহার দেন। প্রথম বাংলাভাষায় প্রাপ্ত থিসিসটিকে তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করেন। এসময় এই বিখ্যাত লাইব্রেরীতে

বাংলা বইয়ের মওজুদ গড়ে তোলার জন্য কর্তৃপক্ষকে তিনি অনুরোধ করেন। কেননা এই লাইব্রেরীতে কোন বাংলা বই নেই বলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে অবহিত করেন।

অতঃপর তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার এবং জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র পাটনা জংশন হ'তে পূর্বদিকে ১৪ কিলোমিটার দূরে ছাদেকপুর গমন করেন। যেখানে মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও তাদের বংশের পারিবারিক বাসস্থান ইংরেজ সরকার নিশ্চিহ্ন করে ময়লা ফেলার স্থানে পরিণত করেছে। তাদের পরবর্তী বংশধরগণ পার্শ্ববর্তী নানমূহিয়াতে বসবাস করেন। যা পাটনা জংশন থেকে পূর্বদিকে ৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত। সেখানেই বর্তমান 'ইমারতে আহলেহাদীছ ছাদেকপুর পাটনা' কেন্দ্র অবস্থিত। যা বর্তমানে 'মীর শিকারটোলা' নামে পরিচিত। ভারতীয় সি. বি. আই -এর অত্যাচারের আশংকায় বিগত তিন বছর যাবৎ 'ইমারত' সাইনবোর্ডটিও সরিয়ে রাখা হয়েছে' *(দ্র. আত-তাহরীক জুলাই ১৯৯৮, ১/১১ সংখ্যা, ৫১-৫২ পৃ.)*।

অত্র বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর প্রকাশনা সম্ভারে আরেকটি অনন্য ও মূল্যবান সংযোজন। এটি মূলতঃ ক্বাইয়ূম খিযির কর্তৃক উর্দূ ভাষায় সংকলিত صادق پور پٹنہ : قربان گاہ آزادیٔ وطن (ছাদেকপুর-পাটনা : ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গের সূতিকাগার) (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০)-এর বঙ্গানুবাদ।

বইটি ১৯৮৯ সালের ১৩ই নভেম্বর দিলালপুর, সাঁওতাল পরগণা, বিহার-য়ে অবস্থিত মাদ্রাসা শামসুল হুদা থেকে সংগ্রহ করে দেন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ যেলার লালগোলা ইসলামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা ইসহাক মাদানী। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন!

পুস্তিকাটি প্রথম অনুবাদ করেন আটুয়া, পাবনার ভাই আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী (এম, এ, উর্দূ)। যা মাসিক 'আত-তাহরীক'-য়ে ধারাবাহিকভাবে

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ১৯৯৮ যথাক্রমে ১/৫, ১/৬, ১/৮, ১/১১ মোট চার সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে অনুবাদ করেন ভাই আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ)। আমরা উভয় অনুবাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার সর্বোত্তম বদলা দান করুন!

বইটির শুরুতে ছাদেরপুরী পরিবারের উপর সম্পাদকের একটি প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে, যেটি ইতিপূর্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ-এর গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে *(তৃতীয় সংখ্যা ১৯৯৭-৯৮, পৃ. ১১৩-৩০)*। আর শেষে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগের গবেষণা সহকারী ড. নূরুল ইসলামের একটি নিবন্ধ ও মূল বইয়ের প্রচ্ছদসহ কিছু ছবি যুক্ত করা হয়েছে।

পরিশেষে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ এবং তার সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। স্ব স্ব ইখলাছ অনুযায়ী আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পারিতোষিক দান করুন! সেই সাথে দীন সম্পাদক, তার মরহূম পিতা-মাতা, সৎকর্মশীল পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ত তিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী
১০ই জুলাই সোমবার ২০২৩।

বিনীত
সম্পাদক।

ছাদেকপুর, পাটনাঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গের সূতিকাগার

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যালেম ইংরেজের হাতে নির্যাতন ও নিষ্পেষণের নির্মম ও নিষ্ঠুর কাহিনী যারা শুনেছেন তারা হয়তো এমন কাহিনী কমই শুনে থাকবেন, যা পাটনা শহরের ছাদেকপুর মহল্লাবাসীদের উপর বৃটিশ সরকার করেছিল।[১]

ইতিহাসের যে পৃষ্ঠাগুলিতে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, সেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের বেদনাবিধুর আহাজারি থেকে উদ্গত ধোঁয়ার দৃশ্য আজও চোখের সামনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে ওঠে। সে ইতিহাসের প্রতিটি ছত্রে বৃটিশ কয়েদখানায় মুজাহিদদের হাতে-পায়ে পরানো বেড়ির কড়াগুলি দৃশ্যমান হয়ে রয়েছে। খুনরাঙা এ কাহিনী ইতিহাসের সেই সময়ের, যখন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ বাধ্যগত অবস্থার ছাইয়ের স্তূপে চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজদের নগ্ন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জালে এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে, হিন্দুস্থানের কোন ব্যক্তির পক্ষেই না মাথা তোলার শক্তি ছিল, না মুক্তির কোন পথ তারা দেখতে পাচ্ছিল। ইংরেজদের যুলুম ও নির্যাতনের মাত্রা এতই বেশী ছিল যে, সে সময় হাসত না কাননে কোন ফুলকলি, আর ঝরাতো না শিশির কণা কোন অশ্রুধারা। এমনই ভয়ঙ্কর ও বিপদসঙ্কুল পরিবেশে ঠাণ্ডা ছাইয়ের নীচে সন্ধান করে চাপা পড়া বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমূহকে যে দেশপ্রেমিক মুজাহিদগণ পুনরায় সতেজ করেছিলেন, তন্মধ্যে ছাদেকপুর পরিবারের জীবন উৎসর্গকারী আলেমদের অবিরত সংগ্রামের ইতিহাস অবিস্মরণীয়। তারা বিপ্লবের নিভে যাওয়া স্ফুলিঙ্গ সমূহকে

---

১. ছাদেকপুর বর্তমান বিহারের রাজধানী পাটনা শহরের একটি মহল্লার নাম। এখন যেখানে পাটনা মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং ও মার্কেট অবস্থিত, তার পুরোটাতেই একদিন ছাদেকপুরী আলেমদের আলীশান ইমারত ছিল। তাদের জিহাদী আন্দোলনের কথা হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খৃষ্টান সবাই স্বীকার করেন। এজন্য ইংরেজ সরকার এক প্রহসনমূলক বিচারে প্রথমে তাঁদের ফাঁসি ও পরে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসনের আদেশ দেয় এবং তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ ক্রোক করে। তাদের ঘর-বাড়ী সমূলে নিশ্চিহ্ন করে। এমনকি তাদের পূর্বপুরুষদের কবরস্থান পর্যন্ত লাঙ্গল দিয়ে খুঁড়ে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হয়।

২২.০৬.১৯৯৮ ইং তারিখে আমরা স্বচক্ষে এই জিহাদ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। যা বর্তমানে 'ইমারতে আহলেহাদীছ ছাদেকপুর, পাটনা' বলে পরিচিত।-সম্পাদক।

চালায়। দেশের স্বাধীনতাকামী বন্দীদের উপর এই নিপীড়ন ও যবরদস্ত ীমূলক রায়ের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তার বর্ণনা 'তাওয়ারীখে আজীব' গ্রন্থকারের মুখে শুনুন।-

'আমার সে সময়ের মানসিক অবস্থা খুব মনে আছে। ফাঁসির হুকুম শুনে আমার এমন আনন্দ হচ্ছিল যে, সাত মহাদেশের ক্ষমতা করায়ত্ত হ'লেও আমি এত আনন্দিত হতাম না। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীকেও খুব হাসি-খুশী দেখাচ্ছিল। এদিন আম্বালা কোর্টে বহু পুলিশ ও হুজুগে নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিল। এহেন অবস্থা দেখে পুলিশ সুপার পার্সিন আমার কাছে এসে বললেন, 'তোমাদের ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়েছে শুনে তোমাদের যেখানে কান্নাকাটি করা উচিত, সেখানে তোমরা এত আনন্দিত কেন?' আমি বললাম, 'শহীদ হওয়ার আকাংখায়। ইসলাম ধর্মে এটি আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নে'মত। তোমরা এ নে'মতের কী বুঝবে?'

হৃদয়বানরা ভেবে দেখুন! ধৈর্যের, দৃঢ়তার ও বীরত্বের এ কেমন উঁচুমানের দৃষ্টান্ত ছাদেকপুরের এই মুজাহিদগণ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন!

১৮৬৪ সালের ২রা মে ফাঁসির হুকুম জারির পর ১৮৬৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই মহান ব্যক্তিদের পৃথক পৃথক ফাঁসির সেলে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। মৃত্যুর দণ্ডাদেশের দ্বিতীয় দিন ভোরে ক্যাপ্টেন টাই, এস.পি পার্সিন এবং আম্বালার ডেপুটি কমিশনার জেলখানায় আসেন এবং জেলখানার কর্তা ব্যক্তিদের এই কয়েদীদের কঠোরতম শাস্তিদানের নির্দেশের সাথে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীকে আলাদাভাবে তাদের থেকেও কঠিন ও কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেন। ফলে এই যালেম শাসকদের উপস্থিতিতেই একটি বড় কূপের উপর স্থাপিত চলমান টাঙা[১৬] ঘুরানোর কাজে তাকে লাগানো হয়। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আট-

১৬. পানি তোলার প্রাচীনতম পদ্ধতির এক ধরনের যন্ত্রকে টাঙা বলা হয়। উর্দূতে এর অপর নাম রেহাট। ইংরেজীতে বলে PERSIAN WHEEL. এটি মূলত এক ধরনের ঘূর্ণায়মান চাকা। এটি দ্বারা পানি তুলতে হলে দরকার হয় একটা কূপের। চাকার সাথে বালতি বা পানির পাত্র বেঁধে দিয়ে উট, মহিষ, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি পশুর সাহায্যে ঘুরিয়ে কূপ থেকে পানি তোলা হয়। কয়েদীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য হিংস্র বর্বর ইংরেজ সরকার পানি তোলার কাজে পশুর বদলে কয়েদীদের ব্যবহার করত।- অনুবাদক।

দশজন লোক সেটি এক সাথে ঘুরাতো। তা এতই ভারী ছিল যে, আট-দশজন লোক হওয়া সত্ত্বেও খুব কষ্ট করে সেটা ঘুরানো যাচ্ছিল। দু'তিন দিন যাবৎ সারাদিন টাণ্ডা ঘুরানোর ফলে এবং প্রচণ্ড গরমের কারণে মাওলানার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তার পেশাব দিয়ে রক্ত আসতে থাকে। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যেতেন। তার কষ্ট দেখে যেকোন মানুষের চোখ দিয়ে অশ্রু নয় বরং রক্ত ঝরে পড়ার কথা।

অতঃপর এই স্বাধীনতাকামীদের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। এ সময় স্বাধীনতার এই পাগলপারাগণ যেন এক প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত হলেন। প্রতিদিন জুটি বেঁধে ইংরেজ ছাহেব ও মেমরা আসত এবং ফাঁসির ঘরে এই মুজাহিদদের দেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করত। কিন্তু যখন ইংরেজ ছাহেব ও মেমদের জুটি এ সকল ফাঁসির আসামীর চেহারায় ভয়-ভীতি ও হতাশার চিহ্নের বদলে প্রশান্তি ও এক ধরনের বিস্ময়কর খুশির ঢেউ খেলতে দেখত, তখন তারা খুবই অবাক হয়ে যেত। এই বীর মুজাহিদদের এমন অদ্ভুত অবস্থা দেখে কিছু ইউরোপীয় তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা ফাঁসির হুকুম শোনার পর এত আনন্দ প্রকাশ করছ কেন?' উত্তরে মুজাহিদগণ বলেন, 'ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্র পথে এ ধরনের যুলুমের শিকার হয়ে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা মেলে। আর যেকোন মুসলমানের জন্য এটি অর্জন করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়'।

এমন অদ্ভুত উত্তর ইংরেজরা ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত কোন আসামীর মুখ থেকে ইতিপূর্বে কখনও শোনেনি। ফলে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ বিচারকগণ অস্থির হয়ে পড়ল। তারা দেখল, ফাঁসির সাজা তো এই কয়েদীদের মানসিক ফূর্তি এবং আত্মিক আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের শাস্তি দানের পরিকল্পনা এভাবে ব্যর্থ হতে দেখে তারা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে। মুজাহিদদের এহেন মানসিক অবস্থা হিংস্র ইংরেজদের অন্তরে শত্রুতার আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। তারা জিঘাংসার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। এই বিচারকমণ্ডলী মুজাহিদদের কাঙ্ক্ষিত আনন্দ থেকে বঞ্চিত করার জন্য ফাঁসির রায় বদলের কথা চিন্তা করে। এক মুহূর্তের ফাঁসির কষ্টের বদলে মুজাহিদগণ 'কালাপানির দেশে' গিয়ে দীর্ঘ বেদনাদায়ক কষ্ট ভোগ করে যাতে তিলে তিলে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে

যায়, তাদের মাথায় সেই চিন্তা উঁকি দিতে থাকে। ফলে ১৮৬৪ সালের ২৪শে আগস্ট আম্বালার ডেপুটি কমিশনার জেলখানার ফাঁসির প্রকোষ্ঠে এসে ফাঁসির সাজা পরিবর্তন করে কালাপানিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ শোনান। তখন আল্লাহ্র এই খাছ বান্দাদের হৃদয়পটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই হাদীছ ভেসে ওঠে, যেখানে তিনি বলেছেন, সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন নবীগণ। অতঃপর পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ।[১৭]

মাওলানা আব্দুর রহীম বর্ণনা করেছেন যে, সাজা পরিবর্তনের হুকুম জারির পর তাদেরকে ফাঁসির সেল থেকে বের করে ব্যারাকে সাধারণ কয়েদীদের সাথে রাখা হয় এবং জেল কোড অনুযায়ী তাদের গোঁফ, দাড়ি ও মাথার চুল কামিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ যবরদস্তীমূলক কারাবিধির ফলে দাড়ির সুন্নাতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ নে'মত থেকে তাদের সাময়িকভাবে বঞ্চিত করা হয়। কর্তিত দাড়ি হাতে নিয়ে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীকে যখন বলতে শোনা গেল, 'এই দাড়ি আল্লাহ্র পথে কামিয়ে দেওয়া হয়েছে' তখন অন্য সাথীদের মন স্বস্তিতে ভরে গেল।

'আদ-দুর্রুল মানছূর' গ্রন্থকার বলেন, 'মাওলানার ধৈর্য ও দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। যদি তার মতো লোক আমাদের সাথে না থাকতেন, তবে আমরা পা পিছলে পড়তাম। সন্ধ্যায় আমরা একই জায়গায় থাকতাম। মাওলানা অধিকাংশ সময় শাহ নিয়ায ও হাফিযের কবিতা আবৃত্তি করতেন। যার প্রভাবে এক গভীর ধর্মীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি হ'ত। আমরা তো

---

১৭. সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন আমি বললাম, أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ: الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِىَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় কারা? তিনি বললেন, নবীগণ। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ। বান্দাকে তার দ্বীনদারীর মাত্রা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যদি সে দ্বীনদারীতে অবিচল হয়, তবে তার পরীক্ষাও ততটা কঠিন হয়। আর যদি সে তার দ্বীনদারীতে দুর্বল হয়, তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে হয়। অতঃপর বান্দা অহরহ বিপদ-আপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। অবশেষে সে পৃথিবীর বুকে গোনাহমুক্ত হয়ে বিচরণ করে' (তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/১৫৬২)।

ব্যাকুল হয়ে পড়তাম। কিন্তু মাওলানার চেহারায় ফুটে উঠত খুশি ও প্রফুল্লতার ছাপ'।

এমন অসহায়ত্ব ও কয়েদখানার বালা-মুছীবতের মধ্যেও মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর ইসলাম প্রচার ও হেদায়াতের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরা থেমে থাকেনি। যখনই কোন কারারক্ষী সিপাই কুঠরির সামনে দিয়ে যেত, চাই সে হিন্দু হোক বা মুসলিম হোক, তাকে তিনি থামাতেন এবং তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদের কথা শুনাতেন। এছাড়াও আখেরাতের শাস্তি ও কর্মফল প্রাপ্তির কথা এমনভাবে তুলে ধরতেন যে, কারারক্ষী সিপাইরা তাতে দারুণভাবে প্রভাবিত হ'ত। তাদের অন্তরের ব্যাকুলতা চোখ থেকে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ত। তারা তখন এমন স্থির ও নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে যেত যে, তাদের মন সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইত না।

১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এসকল মহান ব্যক্তিকে আন্দামানে নির্বাসনের উদ্দেশ্যে লাহোর জেলে স্থানান্তর করা হয়। অবশ্য মাওলানা আব্দুর রহীমকে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আম্বালা জেলেই রেখে দেওয়া হয়। ছাদেকপুরী এসব মুজাহিদকে দেখে যাতে আম জনতার মনে বৃটিশরাজের প্রতি ভীতি ও আতঙ্ক জন্মে, সেজন্য কর্তৃপক্ষ মুজাহিদদের পায়ে শিকল পরিহিত অবস্থায় আম্বালা থেকে লাহোর পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে।[১৮] কিন্তু ফল হয় উল্টা। তাদের ক্ষত-বিক্ষত পায়ের ছাল থেকে প্রবাহিত রক্ত চলার পথে ইতিহাসের এক অনন্য রেখাচিত্র এভাবে অংকন করে চলে যে, পথে যারাই তাদের এমন কষ্ট দিয়ে হাঁটিয়ে নিতে দেখেছে তাদেরই মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মেছে এবং বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে।

অতঃপর স্বাধীনতাকামী এই বন্দীগণকে টেনে-হিঁচড়ে লাহোর সেন্ট্রাল জেলের ফটকের সামনে আনা হয় এবং ফটকের সামনে সারিবদ্ধভাবে তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়। জেলের দারোগা ছিলেন একজন কাশ্মীরী

১৮. বর্তমান ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের আম্বালা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন থেকে সড়ক পথে লাহোর ২৬৪ কি.মি.। হ'তে পারে কখনও হাঁটিয়ে, কখনও বিশ্রাম নিয়ে তাদেরকে এই দীর্ঘ পথ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।-সম্পাদক।